Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাফিয়া বেগম

রোলঃ ২১৫০০৬০৮

৩০/১১/২০২৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাফিয়া বেগম

রোলঃ ২১৫০০৬০৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাফিয়া বেগম, আইডিঃ ২১৫০০৬০৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০/১১/২০২৩

রাফিয়া বেগম

আইডিঃ ২১৫০০৬০৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১। ভূমিকা ৫

২। রোযার পরিচয় ৬

৩। রোযার হুকুম ৭

৪। রোযার প্রকার ৭

৫। রোযার নিয়ত সম্পর্কিত মাস'আলা ৮

৬। রোযার সময়সীমা ৮

৭। যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় ১০

৮। কাফফারার বিধান ১২

৯। রোযার গুরুত্ব ১৬

১০। রমজানের তাৎপর্য ১৮

১১। আইয়ামে জাহিলিয়াতে রোযা ২১

১২। রোযার ফজিলত ২১

১৩। রোযার প্রতিদান ২২

১৪। রোযাদারের জন্য জান্নাতের বিশেষ দরজা ২৩

১৫। লাইলাতুল ক্বদর ২৩

১৬। ইতিকাফ ২৩

১৭। রোযার বিশেষ অর্জন ২৪

১৮। রোযা সংক্রান্ত আধুনিক মাসাইল ২৫

১৯। উপসংহার ৩১

ভূমিকা

হিজরীবর্ষের নবম মাসটির নাম রমযানুল মোবারক। এ মাসের মর্যাদা ও মাহাত্ম বলার অপেক্ষা রাখে না। এ মাস আল্লাহ তা'য়ালার অধিক থেকে অধিকতর নৈকট্য লাভের উত্তম সময়, পরকালীন পাথেয় অর্জনের উৎকৃষ্ট মৌসুম। ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার এবং তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির ভরা বসন্ত। মুমিন বান্দার জন্য রমযান মাস আল্লাহ তা'য়ালার অনেক বড় নিয়ামত। তিনি এই মাসের প্রতিটি দিবস রজনীতে দান করেছেন মুষলধারা বৃষ্টির মত অশেষ খায়ের-বরকত এবং অফুরন্ত কল্যাণ। মুমিনের কর্তব্য, এই মহা নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হওয়া এবং এর কদর করা।

তবুও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীস শরীফে বিস্তৃত বর্ণনায় রমযান মাসের যে গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (البقرة : ١٨٣)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা বাকারা-আয়াত: ১৮৩)

রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমযান। পরকালীন মুক্তির জন্য শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরোও বলেন,

أحسبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ - (العنكبوت: ٢)

অর্থাৎ, "মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বলার পর তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না!" (সূরা আনকাবুত- আয়াত: ২)

মূলতঃ চুড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। আর সেই প্রশিক্ষণ নেয়ার সর্বোত্তম মাস হলো মাহে রমযান।

রাসূল (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে রমযানের রোযা পালন করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন।" (বুখারী)

এ মাসে বান্দা পার্থিব সকল চাহিদা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর দয়া ও রহমত লাভ করবে, অতীতের সকল পাপাচার থেকে ক্ষমা চেয়ে নতুনভাবে ঈমানী জিন্দেগীর উত্তাপ গ্রহণ করবে, তাকওয়া অনশীলনের মাধ্যমে পুরো বছরের ইবাদত ও ইতাআতের শক্তি সঞ্চয় করবে, চিন্তা

চেতনা ও কর্ম-সাধনায় আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পিত করবে, এই হচ্ছে মুমিনের আনন্দ।

রোযার পরিচয়

রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করে, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম।

পরিভাষায় সওম বলা হয়, প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর নারীর সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার স্ত্রী সহবাস ও রোযা ভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয, নেফাসমুক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - (البقرة : ١٨٣)

অর্থাৎ, "হে ঈমানদার! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।" সূরা বাকারা- (২) ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

অর্থাৎ, "সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।" সূরা বাকারা- (২) ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইরশাদ করেছেন:

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية: صوموالرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فاكملوا العدد.

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরজ, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করা ফরজ।

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোনো মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করেন, তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্গনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত

হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

রোযার হুকুম

রমযানের রোযা ফরজঃ যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বানী−

كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم

অর্থাৎ, তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। অত্র আয়াতের মাধ্যমেই রোযা ফরজ হয়েছে। আবার রমযাজের রোযা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মাদীর 'ইজমা' ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, রমযানের রোযাকে অস্বীকার করলে আস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। মানতের রোযা ওয়াজিব। যেমন পবিত্র কোরআনের বাণী−

وليو فوا نذور هم

অর্থাৎ, (তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে)। উল্লেখ্য, হিজরী দ্বিতীয় সনে রমযানের রোযা ফরজ হয়েছে।

রোযার প্রকার

রোযা ২ (দুই) প্রকার। যথা− ১. ফরজ, ২. নফল।

১. ফরজ রোযাঃ এখানে ফরজের মধ্যে ওয়াজিবকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে ফরজ আবার দুই প্রকার। যথা− ক. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন− রমযানের রোযা, নির্দিষ্ট মানতের রোযা।

খ. যা কোনো কারণে দায়িত্বে অর্পিত হয়। যেমন− রমযানের কাজা রোযা, সাধারনত মানতের রোযা, কাফফারার রোযা।

২. নফল রোযাঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে বিশেষ বিশেষ দিনে যে রোযা রাখা হয়, তাকে নফল রোযা বলে। যেমন− আশুরার রোযা, শাবান মাসের রোযা, শাওয়াল মাসের রোযা ইত্যাদি।

কেউ কেউ রোযাকে নিম্নলিখিত শ্রেণিবিন্যাসে বিভক্ত করেছেন।

১. ফরজ রোযাঃ যেমন রমযানের রোযা।

২. ওয়াজিব রোযা: যেমন মানতের রোযা।

৩. সুন্নত রোযা: যেমন শবে বরাত ও আশুরার রোযা।

৪. নফল রোযা: যেমন ايلم بيض এর রোযা।

৫. মাকরুহ রোযা: যেমন صوم وصال তথা লাগাতার রোযা।

৬. হারাম রোযা: যেমন ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীকের দিন।

রোযার নিয়ত সম্পর্কিত মাস'আলা

১. রমযানের রোযা এবং নির্দিষ্ট মানতের রোযার নিয়ত রাত থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত করা যাবে।

২. রমযানের কাজা সাধারণত মানত এবং যিহারের কাফফারা রোযার নিয়ত রাতে না করলে রোযা বিশুদ্ধ হবে না। কারণ, এ প্রকার রোযার জন্য শরীয়ত প্রবর্তক এর পক্ষ থেকে কোন সময় নির্ধারিত নেই। এজন্য রোযাদারের নিয়ত দ্বারা দিনের প্রথম থেকে রোযা নির্ধারন করতে হবে। আর নির্দিষ্টকরণ সুবহে সাদিক এর পূর্বের নিয়ত না পেলে স্থির হয় না। অতএব, এ প্রকার রোযার সুবহে সাদিকের পূর্বে থেকে নিয়ত শর্ত। এটা প্রথম প্রকারের বিপরীত। কেননা প্রথম প্রকার রোযায় শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে সময় নির্ধারিত , কাজেই যখন দিনের প্রথমাংশে রোযা পাওয়া যাবে, তখন বুঝতে হবে যে নিয়ত এই রোযার জন্যেই। আর দ্বিপ্রহরের পূর্বেকার নিয়ত দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

রোযার সময়সীমা

রোযার সময়সীমা হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে রোযাদারকে সকল প্রকার পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইর্শাদ করেছেন:

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل.

অর্থাৎ, "তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ রাতের কালো রেখা থেকে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের মধ্যে প্রতিভাত না হয়। (অতঃপর নিশাগমন পর্যন্ত রোয়া পূর্ণ করো)।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, রোযার প্রথম ওয়াক্ত দিনের সূচনা থেকে আরম্ভ হয়ে শেষ ওয়াক্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

১. কোন রোযাদার ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করলে।

২. ভূলক্রমে যৌন সম্ভোগ করলে।

৩. স্বপ্নদোষ হলে।

৪. স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত এর দরুন বীর্যপাত হলে।

৫. তেল মালিশ করলে।

৬. শিঙ্গা লাগালে।

৭. সুরমা লাগালে।

৮. স্ত্রীকে চুম্বন করলে।

৯. আপনা আপনি বমি হলে।

১০. কানে পানি গেলে, ধুলা প্রবেশ করলে, ধোঁয়া গলায় গেলে।

১১. কেউ মৃত ব্যক্তি বা পশুর সাথে যৌন কাজ করলে অথবা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র যৌন সম্ভোগ করলে কিংবা স্ত্রীকে চুমু খেলে, কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ করলে যদি তার বীযপাত না হয় তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না।

(উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তি ও পশুর সাথে সঙ্গম করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। যে ব্যক্তি এমন করবে তার কবীরা গুনাহ হবে। তবে যদি মৃত ব্যক্তি ও পশুর সাথে সঙ্গমকালে বীর্যপাত না হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। এখানে গুনাহ হওয়া এক জিনিস আর রোযা ভাঙ্গা না ভাঙ্গা আরেক জিনিস)

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাজা ওয়াজিব হয়

১. স্ত্রীকে চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হলে,

২. ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে,

৩. কোন খাদ্যবস্তু তথা পাথর, লোহার টুকরা, ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেললে,

৪. যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য স্থানে সঙ্গম করায় বীর্যপাত হলে,

৫. জোরপূর্বক রোযাদারকে কিছু খাওয়ানো হলে,

৬. ভূলক্রমে কিছু খেতে আরম্ভ করে রোজা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে,

৭. কুলি করার সময় পেটে পানি চলে গেলে,

৮. রাত মনে করে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করলে,

৯. সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে,

১০. মুখে বমি এনে পুনরায় তা প্রবেশ করালে,

১১. দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্য কণা বের করে গিলে ফেললে।

(আল-মিসবাহুন নূরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী, পৃঃ ১/২০৬-২১১)

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়

রোযা রাখতে অপারগ ব্যক্তির জন্য শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতির সুযোগ রয়েছে। তবে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে বা নষ্ট করবে তাদের জন্য রোযা কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

যেসব কাজে রোযার কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

১. দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস

রোযা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে, চাই তাতে বীর্যপাত হোক বা না হোক সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাজা ও কাফফারা আবশ্যক হবে। হাদীসে এসেছে,

“এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি রোযা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি। বিশ্বনবী তার উপর কাফফারা আবশ্যক করেছিলেন। (বুখারী, তিরমিজি, মুসনাদে আহমদ)

–মুহাম্মদ ইবনে কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিশ্বনবী ঐ ব্যক্তিকে {যে স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল} কাফফারা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজা আদায়েরও আদেশ করেছিলেন। (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক)

তবে রোযার মাসে রাতের বেলায় স্ত্রী-সহবাসে কোন বাধা নেই। আর তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

*স্ত্রী রাজি না থাকা অবস্থায় জোরপূর্বক যদি স্বামী সহবাস করে তাহলে স্ত্রীর রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু তার উপর শুধু পরবর্তীতে কাজা রাখা হবে আবশ্যক হবে কাফফারা দিতে হবে না। কিন্তু স্বামীর উপর কাজা ও কাফফারা উভয়ই আবশ্যক হবে।

২. পানাহার

ইসলামী শরীয়তের ওজর ব্যতীত দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পানাহার করলে ঐ ব্যক্তির ওপর কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করা আবশ্যক।

–এক ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখে (ইচ্ছাকৃতভাবে) পানাহার করল। বিশ্বনবী (স) তাকে আদেশ করলেন, সে যেন একজন দাস আজাদ করে দেয় অথবা দুই মাস (একাধারে) রোযা রাখে কিংবা ষাটজন মিসকিনকে (দুই বেলা) খাবার খাওয়ায়। (দা'রাকুতনি)

–ইমাম জুহরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'রমযানে রোযা রেখে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করবে, তার হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারীর অনুরূপ' অর্থাৎ তাকে কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।

৩. ধুমপান

বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং এ কাজে কাজা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।

৪. সাহরির শেষ সময় জেনেও যারা পানাহার করে

সুবহে সাদিক শেষ হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আজান শুনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খাওয়া-দাওয়া করে অথবা স্ত্রী সহবাসে মিলিত হয়, এতে ঐ ব্যক্তির রোযা বিশুদ্ধ হবে না।

আর যদি কেউ রোযার নিয়ত করার পর এমনটি করে থাকে তবে তাদের জন্য কাজা-কাফফারা দুটোই জরুরী হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সহবাস বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষক এবং তুমরা তাদের পোষাক।' আল্লাহ জানতেন তোমরা আত্মপ্রতারনা করছ। তাই তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ সকালের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা প্রকাশ হয়, তৎপর রোযাকে রাত পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায়ও স্ত্রী-সহবাস করো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এসবের ধারে-কাছে যেও না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করে থাকেন। হয়তো তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। (সূরা বাকারা– আয়াত ১৮৭)

কাফফারার বিধান

রোযার কাফফারা যিহারের কাফফারার মতো। যিহারের কাফফারা হলো–

১. একটি দাস আজাদ করা।

২. অথবা ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখা।

৩. অথবা ৬০ জন মিসকিনকে দু'বেলা আহার করানো।

কাফফারা হলো লাগাতার ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। মাঝখানে একদিনও কাযা করা যাবে না। কাযা হলে আবার প্রথম থেকে ষাটটি রোযা রাখতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখতে না পারে বয়সের কারণে বা অসুস্থ্যতার কারণে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়াতে হবে। একদিনের খানা সদকায়ে ফিতির পরিমাণ টাকা।

রোযা রাখতে সক্ষম ব্যক্তি মিসকিনকে খানা খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ :صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَاأُطِيقُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বললেন, রমযানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, তাহলে এর বদলে একটি গোলাম আযাদ কর। সাহাবী বললেন, আমি এতে সক্ষম নই। নবীজি (সাঃ) বললেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখ। সাহাবী বললেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৬৭১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৬৯৪৪, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-১১০৭, সহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদীস নং-১৯৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৩৫২৭)

রোযা অবস্থায় কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করার হুকুম

রোযা রাখা অবস্থায় কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা মাকরুহ। এখানে স্বাদ গ্রহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোন বস্তুকে জিহ্বার উপর দিয়ে লবণ, মরিচ ইত্যাদি পরীক্ষা করা, গলাধঃকরণ করা নয়। এর কিছু অংশ গলাধঃকরণ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

ছোট বাচ্চার খাবার ও আঠা চিবানোর হুকুম

কোন রোজাবিহীন লোক থাকা অবস্থায় রোযা আদায়কারিনী মহিলা তার বাচ্চার খাবার চিবিয়ে দেওয়া মাকরুহ। তবে কোন রোজাবিহীন লোক না থাকলে চিবিয়ে দেওয়া মাকরুহ নয়। তবে খুব সতর্কভাবে চিবাতে হবে, যাতে কোন অংশ যেন গলায় চলে না যায়।

আর আঠা জাতীয় বস্তু চিবালে রোযা বিনষ্ট হবে না। কেননা তা দাঁতের সাথে জড়িয়ে থাকে, কণ্ঠনালীর ভেতর প্রবেশ করে না। তারপরও সতর্কভাবে চিবানো আবশ্যক।

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি, মুকিম ও সুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম:

অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকার পর যদি মৃত্যুবরণ করে, অথবা মুসাফির ব্যক্তি একামত করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে আর সে কাজা আদায় করেনি, তাহলে যে কয়দিন সুস্থ বা একামত অবস্থায় ছিল সে কয় দিনের কাজা ওয়াজিব হবে। সুতরাং তার মৃত্যুকালে উক্ত দিনসমূহের ফিদিয়া আদায় করার জন্য ওসিয়ত করে গেলে তার মাল থেকে ফিদিয়া আদায় করা তার ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব হবে। আর ওসিয়ত না করলে ওয়াজিব হবে না বরং মুস্তাহাব হবে।

রমযানের কাজা আদায়ের বিধান

রমযানের কাজা রোযা আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সে ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথকভাবেও আদায় করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে লাগাতারও আদায় করতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّا مٍ أُخَرَ ۚ{البقرة:١٨٤} অর্থাৎ, 'অন্যান্য দিনে তা আদায় করবে।' এতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নেই। তবে একাধারে রাখা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, যদি কারো রমযানের রোযা কাজা আদায়ের পূর্বেই পরবর্তী রমযান এসে যায়, তাহলে দ্বিতীয় রমযানের রোযা আদায় করে নিবে, কাজা পরে আদায় করবে।

গর্ভবতী ও দুধ দানকারিণীর বিধান:

গর্ভবতী ও দুধ দানকারিণী যদি ভয় করে যে রোযা রাখলে তাদের সন্তানদের ক্ষতি হবে, তাহলে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে, পরে কাজা আদায় করবে। এতে তাদের ফিদিয়া বা কাফফারা দিতে হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ تعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِالصِّيَامَ-

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত মাফ করে দিয়েছেন আর গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারিণী মহিলার জন্য সিয়াম পালন মাফ করে দিয়েছেন। -ইবনে মাজাহ ১৬৬৭, তিরমিজী হাদিস নং-৭১৫

অতি বৃদ্ধের রোযার হুকুম:

شيخ فاني অর্থাৎ, এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি, যে চলাফেরা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এরূপ ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে না, তবে সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে এক ফিতরা পরিমাণ খাদ্য খাওয়াবে বা তার দাম দিয়ে দিবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন–

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُو نَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ { البقرة:١٨٤ } অর্থাৎ, যারা বার্ধক্যের কারণে অক্ষম তারা একজন মিসকিনকে খাদ্য দিবে। এখানে يُطِيقُونَهُ এর অর্থ لا يُطِيقُونَهُ তবে شيخ فاني যদি পরবর্তীতে কাজা আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে কাজাই করতে হবে।

যে অবস্থায় ব্যক্তির ওপর রোযার বিধান অর্পিত হয় না:

চির উম্মাদ বা বদ্ধ পাগল যার আরোগ্য লাভের কোন আশা নেই, এরূপ উম্মাদ হয়ে যাওয়ার পর তার উপর থেকে রোযার ফরজিয়াত রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে অসুস্থ ও মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার দরুন শরীয়তের বাধ্যনুগত থাকার গন্ডি বহির্ভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে রোযা না রাখার কারণে গুনাহগার হবে না। বরং তখন তার ওপর থেকে রোযার ফরজিয়াত রহিত হয়ে যাবে। এমনকি তার সম্পদ থেকে কারোর ওপর তার পক্ষে কাফফারা বা ফিদিয়া দান করাও ওয়াজিব হবে না।

ফিদিয়া দানের ওসিয়ত করলে তার হুকুম

যদি কারো ওপর রোযার কাজা থেকে যায়, আর এ অবস্থায় মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, এভাবে মৃত্যুমুখে যদি সে রোযার ফিদিয়া দানের জন্য ওসিয়ত করে যায়, তাহলে তার সম্পদ হতে ফিদিয়া আদায় করা ওয়ারিশগণের উপর ওয়াজিব। আর যদি ওসিয়ত না করে আদায় করা মুস্তাহাব। ওসিয়ত বাস্তবায়নের জন্য ওয়ারিশগণের সম্মতি আবশ্যক। যদি সকলে সম্মত না হয় তাহলে ওসিয়ত বাস্তবায়ন আবশ্যক নয়। তবে বণ্টনের পর যদি কোন ওয়ারিশ নিজের অংশ হতে ফিদিয়া আদায় করে, তাহলে করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ওয়ারিশগণের মধ্যে নাবালেগ থাকলে তার অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদ হতে ওসিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

রমযানের দিনে নাবালেগ বালেগ হলে এবং কাফের মুসলমান হলে তার বিধান

রমযানের দিনের বেলায় কোন নাবালেগ বালেগ হলে কিংবা কোন কাফের মুসলমান হলে তার অবশিষ্ট দিন পানাহার হতে বিরত থাকতে হবে এবং এর পরের দিন হতে রোযা রাখতে হবে। আর সেদিনই পূর্ববর্তী দিবসের কোন কাজা করতে হবে না। কেননা ইতিপূর্বে তাদের উপর রোযা ফরজ হবার উপযোগিতা ছিলনা, তাই উক্ত দিনগুলোর কাজাও ওয়াজিব হবে না। আর সেদিনের অবশিষ্টাংশ ও পরবর্তী দিনগুলোর রোযা এজন্য রাখতে হবে যে, মুসলমান ও বালেগ হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে রোযা রাখার উপযোগিতা এসে গেছে।

রমযানের দিনে মুসাফির মুকিম হলে অথবা মহিলা হায়েজ হতে পবিত্র হলে তার বিধান:

রমজানের দিবাভাগে মুসাফির হলে এবং হায়েজ হতে রমণী পবিত্র হলে অবশিষ্টাংশ পানাহার হতে বিরত থাকবে। মুসাফির সুবহে সাদিকের পূর্ব হতে কিছু না খেলে রোযা হয়ে যাবে, আর কিছু খেয়ে থাকলে মুসাফিরের জন্য কাযা করতে হবে, আর হায়েজগ্রস্থ মহিলার জন্য কাজা করতে হবে না।

ইফতার ও সাহরীতে ভুলবশত আগে-পরে হলে তার বিধান

যদি কোন ব্যক্তি সুবহে সাদিক হয়নি মনে করে সাহরী খায়, এরপর জানতে পারল যে, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে অথবা সূর্যাস্ত গেছে ভেবে পানাহার করার পর দেখা গেল যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে তাদের ওপর সে দিনকার কাজা ওয়াজিব হবে; কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা তাদের ভুলবশত হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি।

রোযা অবস্থায় পিরিয়ড চলে আসলে তার হুকুম

রোযা পালনকারী নারীর যদি সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগেও পিরিয়ড দেখা দেয়, তাহলে তাহার ওই দিনের রোযা বাতিল হয়ে যাবে। পরে রোযাটি কাজা করতে হবে।

রমযান মাসে ঔষধ খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রাখার হুকুম

প্রতি মাসে মহিলাদের পিরিয়ড হওয়াটা একটি স্বাভাবিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালার নেজাম। রমযানে এটাকে বন্ধ রাখা উচিত হবে না। এতে শারিরীকভাবে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে যদি কেউ ঔষধ খেয়ে বন্ধ রাখে তাহলে তা তার জন্য জায়েজ আছে।

আল্লাহ তা'য়ালা যেহেতু পিরিয়ডের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন, তাই সে সময় পিরিয়ড স্বাভাবিক রেখে রোযা না রাখলে কোন সমস্যা নাই। পরে তা কাজা করে নিবে। ইনশাআল্লাহ এতে সওয়াব হবে বেশি। কারণ রমযানে সবার সাথে রোযা রাখা সহজ। কিন্তু রমযানের পর একা একা রোযা রাখাটা কঠিন। আর যে ইবাদত পালন যত কষ্টকর, তার সওয়াবও তত বেশি।

তবে যদি কোন মহিলা রমযান আসার আগেই এবং পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে ঔষধ খেয়ে তা বন্ধ করে দেয়, তাহলে তার জন্য রোযা রাখতে হবে। কারণ, এতে করে তার উপর রোযা না রাখার কোন কারণ বিদ্যমান থাকছে না। তাই তার জন্য রোযা রাখা আবশ্যক হবে।

কিন্তু যদি রমযান চলে আসে, আর পিরিয়ড শুরু হয়ে যাওয়ার পর ঔষধ খেয়ে বন্ধ করে দেয়, তাহলে পিরিয়ডের সর্বনিম্ন সীমা কমপক্ষে ৩ দিন পর্যন্ত রোযা রাখতে পারবে না। এরপর থেকে রোযা রাখা আবশ্যক। যেহেতু পিরিয়ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর পিরিয়ড শুরু হলে এর সর্বনিম্ন সময়সীমা হলো তিন দিন। তাই পিরিয়ড শুরু হতেই ঔষধ খেয়ে বন্ধ করে ফেললেও ধরা হবে পিরিয়ড জারী আছে তিন দিন পর্যন্ত। তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে হিসেবে রোযা রাখা আবশ্যক। (কিতাবুল ফাতওয়া-৩/৪০৫)

একাধিক রোযা বিনা ওজরে ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম

একাধিক রোযা বিনা ওজরে ভেঙ্গে ফেললে সেগুলোর জন্য একটি কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাফফারা আদায় করা লাগবে না। তবে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে রোযা কাজা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, শরয়ী ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত রমযানের রোযা ছেড়ে দেওয়া অনেক বড় গুনাহ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন–

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ، وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সফর বা অসুস্থতা ছাড়া রমযানের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিবে সে পুরো জীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা-৯৮৯৩)

–কিতাবুল আছল ২/১৫৩; আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৭৫; ফাতওয়া বায্যাযিয়া ১/১০৩; মারাকিল ফালাহ পৃঃ ৩৬৭; আদ্দুররুল মুখতাব ২/৪১৩

রোযার গুরুত্ব

ইসলামী জীবন বিধানে রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। রোযাকে আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করেছেন। এটি ইসলামী জিন্দেগীর পঞ্চ স্তম্ভের চতুর্থতম স্তম্ভ। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা–

১। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া।

২। নামায কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযানের রোযা পালন করা।

৫। সামর্থবান ব্যক্তির বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা স্থাপিত হয়। ধৈর্যশীল আত্মা ও তাকওয়াপূর্ণ জীবনের প্রয়োজন।

মাহে রমযানে আমাদের জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল হওয়ার কারণেই রমযান মাসের এতো গুরুত্ব।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ-

অর্থাৎ, 'রমযান' এমন একটি মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্যে হিদায়াত এবং সত্য-পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ আর হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১৮৫)

পুনরায় বলা হয়েছেঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পায় সে যেন অবশ্যই তাতে রোযা পালন করে। (সূরা বাকারাঃ আয়াত-১৮৫)

রমজানের তাৎপর্য

১. রমযান রহমতের মাস

রমযান মাস রহমতের মাস হাদীস শরীফে এসেছেঃ

هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَتٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ-

অর্থাৎ, "এটি এমন একটি (রমযান) মাস, যার প্রথম দশক 'রহমতের', দ্বিতীয় দশক 'মাগফিরাতের' ও তৃতীয় দশক 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি' লাভের জন্য নির্দিষ্ট।" (বায়হাকী)

"রমযানের প্রতিটি দিবা-নিশিতে অসংখ্য জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেয়া হয়। আর প্রতিটি মুসলমানের একটি করে দুআ কবুল করা হয়।"

রমযান মাসে আল্লাহর অপার রহমতের বারিধারা সকল মুমিন বান্দার অন্তরকে সিক্ত করে তুলে। এরই মাধ্যমে তাদের ঈমানের তেজদীপ্ততা বৃদ্ধি পায়। ধন্য হয় প্রতিটি মানুষ।

রমযানের রোযার ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট মুমিনদের অভাবী ও দরিদ্র লোকদের দুঃখ সরাসরি অনুভব করার বাস্তব শিক্ষা দেয়। গরীবের বন্ধু হয় ধনীরা। বুঝতে পারে তাদের দুঃখ-দুর্দশা। একে অপরের দরদী হয়। দুঃখ লাঘব করার প্রয়াসে একত্রে কাজ করে। তাতে সমাজের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ সব কিছুই আল্লাহর রহমতের কারণে। এজন্যেই বলা হয় রমযান মাস রহমতের মাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেভাবে বান্দাকে বেশি রহমত দেন, সেভাবে রোযাদারের উচিত আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি বেশি দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ-

অর্থাৎ, "জমীনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো। আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

রাসূল (সাঃ) বলেন, রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরে জিবরাঈল (আ.) অন্যান্য ফেরেশতাগণের সাথে জমীনে নেমে আসেন এবং ঐ বান্দাহর জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করেন, যে দাঁড়িয়ে, বসে আল্লাহর জিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকে। (বায়হাকী)

২. রমযান ইখলাসের মাস

ইখলাস হচ্ছে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবনের সকল কাজ করা। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, পরোপকার, ইকামতে দ্বীনের কাজ করা, শিক্ষা দান করা, শিক্ষা গ্রহণ করা, মানুষকে খাওয়ানো, দান করা ইত্যাদি সকল নেক কাজ একমাত্র খালিসভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে। নিয়ত খালিস না থাকলে ইবাদত শির্কযুক্ত হতে পারে। আর শির্কযুক্ত ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আল্লাহ তা'য়ালা রমযানের এক মাস রোযা ফরজ করে লোক-দেখানো মনোবৃত্তি দূর করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। রোযা এমন এক ইবাদত রোযাদার ব্যতীত আর কেউই বলতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে সে রোযা রেখেছে কিনা? মানুষ দেখবে না গভীর অন্ধকারে সে একাধিক রোযা ভঙ্গের কোন কাজ করলো কিনা অথবা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে সে পানি পান করলো কিনা। রোযাদার কেবলমাত্র এক আল্লাহর ভয়েই সেখানে এমন কোন কাজ করে না যাতে করে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এটাই ইখলাস। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে ও সকল ইবাদতে বান্দা যাতে নিষ্ঠাবান হয় রমযান সে শিক্ষাই দেয়। পবিত্র আল কোরআনে বলা হয়েছেঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ-

অর্থাৎ, "আর তোমরা তাদেরকে এটা ব্যতীত অন্য কোন হুকুমই দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করুক।" (সূরা বায়্যিনা: আয়াত-৫)

৩. রমযান তাওবা কবুলের মাস

তাওবা শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা। গুনাহগার বান্দা স্বীয় গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ রকম গুনাহ যাতে পুনরায় সংঘটিত না হয় সে জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। বান্দা যত বড় গুনাহই করুক না কেন, সে যদি খাঁটি মনে তাওবা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, তা হলে আল্লাহ তা'য়ালা তার তাওবা কবুল করেন এবং তাকে হকের পথে থাকার তাওফীক দেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তিনি সেই সত্তা যিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের গুনাহ মাফ করেন এবং তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। (সূরা শুরা: আয়াত-২৫)

ক্ষমা ও মাগফিরাতের বিরাট সুযোগ রয়েছে এ রমযান মাসে। এ মাসে দিবা-নিশিতে হরহামেশা আল্লাহ তা'য়ালা দোয়া কবুল করেন এবং যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার তাওবা কবুল করেন। কাজেই আমাদের উচিত রমযান মাসে সগীরা-কবীরা সকল গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করা। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ-

অর্থাৎ, "যে লোক রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

৪. রমযান আত্মসংযমের মাস

রমযান মাস আত্মশুদ্ধির মাস। রোযা রাখার মাধ্যমে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মহান সুযোগ পাওয়া যায়, যা অন্য কোন ইবাদতে পাওয়া সম্ভব নয়। আত্মসংযম সাধনে রোযা হচ্ছে প্রশিক্ষণ স্বরূপ। আত্মসংযম ও সবরের মাধ্যমেই রোযার ফায়দা লাভ করা যায়। রোযা মানুষের নৈতিক চরিত্র এমন এক পর্যায়ে উন্নিত করে, যাতে করে রোযাদার ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, নফসের কামনা-বাসনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। রোযা মানুষের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে এমনভাবেই বশে রাখতে সক্ষম করে তোলে যে, সকল ধরনের লোভ-লালসা এবং নিজের নফসের অশুভ শক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সাধারণত মানুষের পাশবিক কামনা-বাসনার উৎস হচ্ছে তিনটি জিনিস। যথা– ১. খাদ্য, ২. যৌন চাহিদা, ৩. বিশ্রামের চাহিদা।

এ তিনটি জিনিসের জন্যই মানুষ দুনিয়াতে অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদ ও সন্ত্রাসের মত জঘন্য কাজ করে থাকে। রোযা এ তিনটিকেই নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ত করে ব্যক্তিকে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সমর্পণ করিয়ে দেয়। তখন যদি কোন সন্ত্রাসী কোন রোযাদার ব্যক্তিকে ফেতনায় জড়াতে চায়, এমনকি হত্যা করতে চায়, তখনই সে একথা বলে দেয়, اَنَا

صَا ئِم "আমি রোযাদার"। সংযম শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রোযা ছাড়া অন্য কোন ইবাদতে নেই।

৫. রমযানের মাস পরিশ্রম ও প্রশিক্ষণের মাস

"পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।" শ্রম-সাধনা ছাড়া কোন কিছুই লাভ করা যায় না। রমযান হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের ও শ্রম-সাধনার মাস। পরবর্তী এগারো মাসে আল্লাহর ইবাদত, হালাল রিযক অনুসন্ধান এবং দাওয়াতে হকের কাজসহ জীবনের যাবতীয় কাজের জন্য বান্দাকে কতটুকু পরিশ্রমী হতে হবে তারই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। রমযান মাসে ত্রিশ দিন ব্যাপী দীর্ঘ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হয়। অতঃপর অবসাদগ্রস্থ শরীরে মাগরিবের নামায পড়তে হয়। একটু পরেই ঈশা ও তারাবীহ নামাযের আহ্বান। তারাবীহ নামায শেষে একটা ফজর পর্যন্ত না ঘুমিয়ে সেহরীর জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে সজাগ হতে হয়, তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হয়, কুরআন তিলাওয়াত অধ্যয়নের পরপরই ফজরের নামায। এর চেয়ে পরিশ্রমের উত্তম কর্মসূচী আর কি হতে পারে? মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম মিল্লাতের অলসতা ও শ্রবিমুখতাকে দূর করার জন্যই এ সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একই সাথে রমযানের সিয়াম সাধনায় মশগুল থাকে। কিভাবে রমযান শেষ হয়ে যায় রোযাদাররা তা টেরও পায় না।

৬. রমযান দাওয়াতে দ্বীনের মাস

রমযান হচ্ছে দাওয়াতে দ্বীনের সর্বোত্তম মাস। যেহেতু এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ববাসীকে হকের দাওয়াত দেয়ার জন্য।

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-

অর্থাৎ, "তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে।"

দাওয়াতে দ্বীনের গুরু দায়িত্ব সকল নবীর উপরই ফরজ ছিল। সকল নবী ও রাসূল অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত সম্বলিত গ্রন্থ রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। একারণেই এ মাসের মর্যাদা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক। তাই বলা হয় রমযান মাস দাওয়াতে দ্বীনের মাস। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর ইন্তিকালের পর আজ উম্মতে মুহাম্মদীর উপর দাওয়াতে দ্বীনের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ কাজ করার উত্তম সময় হচ্ছে মাহে রমযান। এ সময় মানুষের মন-মানসিকতা সুন্দর থাকে। সত্য গ্রহণ করতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এজন্যে দাওয়াতী কাজও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। রাসূল (সাঃ) রমযান মাসে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ তীব্র থেকে তীব্রতর করতেন। আমাদেরও রমযান মাসে এ কাজ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে করা উচিত।

আইয়ামে জাহিলিয়াতে রোযা

হযরত ঈসা (আঃ)- এর পর থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর নবুয়্যত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়াত বা জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয়। এ সময় ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও মুশরিকরা বিভিন্নভাবে রোযা পালন করত। বিশেষ করে মক্কার কুরাইশরা আশূরার রোযা পালন করতো। (বুখারী)

মুহাররমের ১০ তারিখে কাবাঘরে গিলাফ লাগানো হত সেদিন আরবরা রোযা রাখতো। (আহমদ)

সাওম ফরজ হওয়ার সময়কাল

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনায় উপনীত হলে তিনি আশূরার রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে তা পালন করার নির্দেশ দেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর 'আশূরার' রোযা সুন্নাতরূপে পরিগণিত হয়।

রোযার ফজিলত

রাসূল (সাঃ) বলেন: রমযানে জান্নাতের দরজা খোলার পর এর মধ্যে আর কোন দরজাই বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা এই বলে আহ্বান করে বলেন: "হে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! অগ্রগামী হও এবং হে মন্দের উদ্যোগী পিছনে সরে যাও। আর আল্লাহর জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত ব্যক্তি বর্গ রয়েছে। তুমি হয়ত তাদের মধ্যে হতে পারো।" এ আহ্বান প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে। (তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

রাসূল (সাঃ) বলেন: রমযানের সম্মানার্থে জান্নাতকে সজ্জিত করা হয় এবং এ মাসের প্রথম রাতে আল্লাহর আরশের নীচে থেকে জান্নাতের পাতার ভেতর দিয়ে এক মৃদুমন্দ বাতাস হুরদের উপর দিয়ে বয়ে যায়। তখন তারা রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে থাকে: হে প্রভু! আপনি আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের জোড়া এনে দিন, যাদের রেখে আমাদের নয়ন যেন জুড়িয়ে যায় এবং তাদেরও চোখ দুটো তৃপ্ত হয়ে যায়। (বায়হাকী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর রোযা ফরজ করেছেন। আর আমি তাতে কিয়াম (তারাবীহ নামাজ পড়া)-কে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পুণ্যের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তারাবীহ নামাজ পড়বে, সে সকল পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেমনভাবে সে জন্মদিনে নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল। (নাসাঈ, তারগীব)

সাওমের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارِكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَبُ السَّمَاءِ وَتُغلَقُ فِيهِ اَبْوَابُ الْجحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌمِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرُمَ-

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: তোমাদের সামনে রমযান মাস সমুপস্থিত। তা এক বরকতময় মাস। আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায় জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বড় বড় শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। যে লোক এ রাতের মহা কল্যাণ লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকলো, সে সত্যিই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী)

রোযার প্রতিদান

বুখারি শরীফে বর্ণিত হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন, সিয়াম এবং কোরআন হাশরের ময়দানে বান্দা-বান্দীর জন্য সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন রাসূলে পাক (সাঃ) বর্ণনা করেন, প্রত্যেক বস্তুর যাকাত রয়েছে, তেমনি শরীরেরও যাকাত আছে, আর শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা পালন করা। অর্থাৎ, যাকাত দানে যেভাবে মালের পবিত্রতা অর্জন হয়, তেমনি রোযা পালনের মাধ্যমে শরীর পবিত্র হয়, গুনাহ মুক্ত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন, মানুষের প্রত্যেক আমলের সওয়াব দশ গুণ হতে সাত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। হাদিসে কুদসিতে আছে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন 'রোযা এ নিয়মের ব্যতিক্রম, কেননা তা বিশেষভাবে আমার জন্য, আমি স্বয়ং তার প্রতিদান দেব, বান্দা তার পানাহার ও কামনা-বাসনাকে সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করেছে।'

রোযাদারের জন্য জান্নাতের বিশেষ দরজা

হযরত সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সাঃ) ইরশাদ করেন, জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। এরমধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান'। এ দরজা দিয়ে শুধু রোজাদারগণ প্রবেশ করবে। অন্যরাও এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে। কিন্তু রোযাদার ব্যতীত অন্য কাউকে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। (বুখারি ও মুসলিম)

লাইলাতুল ক্বদর

লাইলাতুল কদর হচ্ছে একটি রাত যে রাতে জেগে একমনে ইবাদত-বন্দেগী করলে এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। এক হাজার মাসের হিসাব করলে কদরের এক রাতের ইবাদত ৮৬ বছর ৪ মাসের সমান। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তার চেয়েও বেশি বা উত্তম বলেছেন। যে ব্যক্তি কদরের রাতে সওয়াবের আশায় ইবাদত করবে, তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ), আমি যদি কদরের রাত্রি পাই, তাহলে আমি কী দোয়া পড়ব?' তখন রাসুল (সাঃ) বলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নি' এই দোয়া পড়বে। হাদিসে আছে, তোমরা রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে (২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখ) শবে কদর তালাশ করবে।

ইতিকাফ

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, 'ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মসজিদ' তোমরা মসজিদে ইতিকাফ করো। ইতিকাফ শব্দের অর্থ নিজেকে আবদ্ধ রাখা। শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ হলো, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় শর্ত সাপেক্ষে নিয়ত সহকারে পুরুষেরা মসজিদে ও নারীরা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা। রমযানের শেষ দশক (২০ রমযান সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত) ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া। বিনা প্রয়োজনে অর্থাৎ গোসল, খাবার, প্রস্রাব-পায়খানা ব্যতীত অন্য কোনো অজুহাতে ইতিকাফের স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। ইতিকাফ অবস্থায় কোরআন তিলাওয়াত, জিকির, নফল নামাজ ইত্যাদিতে মশগুল থাকবে।

রোযার বিশেষ অর্জন

১. আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যের প্রশিক্ষণ: আল্লাহর প্রভূত্ব এবং একত্ববাদের স্বীকৃতি তার ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রোযার ন্যায় ইবাদত পালনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি এবং নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ মনে করে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে থাকে। রোযার মাসে নিষিদ্ধ সামগ্রীর ভোগ বিলাস ও পানাহার হতে বিরত থেকে দিনের বেলা বৈধ কাজগুলোকে তার হুকুমে সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

২. আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে: ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকার নামই তাকওয়া। আর আল্লাহ রোযাকে ফরজ করেছেন এ গুণ সৃষ্টির জন্যই। তাই রোযা দ্বারা মানুষের মাঝে খোদাভীতি ও পরহেজগারিতার গুণ ও তার বৈশিষ্ট্য ফিরে আসে।

৩. নৈতিক চরিত্র উন্নত করে: রোযা মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে। রোযা রাখার ইচ্ছা করার সাথে সাথে মানুষের মন হতে পাপাচার, মিথ্যাচার, স্বেচ্ছাচারিতা, অসৎ কাজ ও ঝগড়া করার মানসিকতা দূর হয়ে যায়। কেননা, এগুলো পরিত্যাগ করতে না পারলে তার রোযাই হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলের বানী:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَا جَةٌ فِيْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابهُ-

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়তে পারেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করে রোযা রাখায় আল্লাহর কাছে কোন মূল নেই।" (বুখারি)

কেই যদি রোযা রেখে রোযার শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করে মানুষের সাথে সাথে সদাচারের বিপরীত চরিত্র প্রদর্শন করে, তাহলে এ অনুষ্ঠানিক কাজের কোন ফল পাবে না। রাসূলে বাণী:

كَمْ مِنْ صَا ئِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَا مِهِ اِلَّا الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَا مِهِ اِلَّا السَّهْرُ-

অর্থাৎ, "অনেক রোযা পালনকারী ক্ষুৎপিপাসা ছাড়া আর কোন কিছু লাভ করতে পারে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদতকারী অনেক মানুষও রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছু লাভ করতে পারে না।" (সুনানে দারেমী)

৪. আল্লাহর শোকর আদায়ের মানসিকতা সৃষ্টি: পবিত্র রোযার মাসে যে আল্লাহ তা'য়ালা শারিরীক ও মানসিক দিক দিয়ে রোযা রাখার তাওফীক দিলেন এবং অগণিত নিয়ামত দিয়ে সেহরী ও ইফতারী করার সুযোগ করে দিলেন, সেই আল্লাহ পাকের শোকরগুজারী করার জন্য মানুষের মনমানসিকতা পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উন্মুখ থাকে। আল্লাহর বাণী:

وَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-

অর্থাৎ, “যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো, তবে তোমরা তাঁর দানরাজির শুকরিয়া আদায় করো।” (সূরা নাহলঃ ১১৪)

৫. হালাল গ্রহনের বাস্তব প্রশিক্ষণঃ সিয়াম সাধনাকারী মানুষ হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ ও বর্জনের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

৬. নফসের কর্তৃত্ব বিলোপঃ রোযা দ্বারা রোযাদার ব্যক্তি নিজের নফসের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম মানতে বিজয়ী হন। সিয়াম সাধনাই মানব প্রবৃত্তিকে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করে নিজেকে আল্লাহর মর্জির বিপরীত কাজ হতে বিরত রাখে। তাই রোযা দ্বারা মানবগণ নফসের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ লাভ করে।

৭. আল্লাহর নৈকট্য লাভঃ রোযার মাধ্যমে রোযাদার ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমেই পরকালে সে আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভে নিজেকে ধন্য করতে সক্ষম হবে।

৮. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ঃ আল্লাহ তা’য়ালা একই সময় সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজকে একই কর্মসূচীর আওতায় এনে একই ভাবধারায় পরিচালনা করার যে শিক্ষা দিচ্ছেন তাতে প্রত্যেক রোযাদার ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার প্রতি অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় ও নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

৯. সাওম পালনের ধৈর্যশীল হওয়া যায়ঃ ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে সত্যের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চরম ধৈর্যের প্রয়োজন। রোযা মানুষকে তেমনি ধৈর্যশীল করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ অর্থাৎ, রোযা ধৈর্যের অর্ধেক। (তিরমিজী)

১০. তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়ঃ রোযা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। রোযা ফরজ হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, “যাতে তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারো বা মুত্তাকী হতে পারো।” তাকওয়া মানব জাতির জন্য এক মৌলিক ও মহৎ গুণ। এ গুণ অর্জন করা প্রত্যেকটি মুমিনের কর্তব্য। একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে– অন্য কোন গুণের দ্বারা নয়। তাকওয়া মানে হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী ও আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে অবস্থান করা।

রোযা সংক্রান্ত আধুনিক মাসাইল

১। ইনজেকশন:

ইনেজকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। চাই তা গোশতে নেয়া হোক কিংবা রগে। কারণ যে রাস্থায় ইনজেকশন দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ঐ রাস্তা রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়।

২। স্যালাইন:

স্যালাইন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্যালাইন নেওয়া রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়। তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ।

৩। ইনসুলিন:

ইনসুলিন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ ইনসুলিন রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না এবং গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায়ও পৌঁছে না।

৪। পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ব্যবহার:

পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ পেশাবের রাস্তা রোযা ভঙ্গ হবার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনিভাবে পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন বস্তু ভেতরে প্রবেশ করলে তা মূত্রথলিতে পৌঁছে মাত্র। আর মূত্রথলি রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।

৫। যোনিদ্বারে ঔষধ ব্যবহার:

যোনিদ্বারে ঔষধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনিভাবে যোনিদ্বার দিয়ে কোন বস্তু ভিতরে প্রবেশ করলে তা এমন কোন খালি জায়গায় ঢুকে না যেখানে ঢুকলে রোযা ভঙ্গ হয় বরং জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে ঢুকে। আর গর্ভাশয় রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।

৬। সিস্টোসকপি:

সিস্টোসকপি করলে রোযা ভাঙ্গবে না। অর্থাৎ পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার লাগানো।

৭। গর্ভপাত:

ক. এম.আর-

এম.আর করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। এম.আর হলো মাসিক নিয়মিতকরণ। গর্ভধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুতে 'এম.আর' সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে জীবিত কিংবা

মৃত ভ্রূণ বের করে নিয়ে আসাকে ‘এম.আর’ বলে। গর্ভধারণের কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, ‘এম.আর’ এর কারণে ঋতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এম.আর বলে।

উল্লেখ্য, যদিও ‘এম.আর’ ডাক্তারদের পরিভাষায় গর্ভপাত কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে ‘এম.আর’ গর্ভপাতের হুকুমে নয়। কেননা এম.আর আট সপ্তাহের ভেতরে হয় আর এ সময়ে সাধারণত বাচ্চার কোন অঙ্গ, নখ, চুল ইত্যাদি প্রকাশ পায় না। আর কোন অঙ্গ প্রকাশ হবার পূর্বে কোন ভ্রুণ বেরিয়ে আসলে একে গর্ভপাত বলা হয় না এবং এরপর যে স্রাব হয় এখানে নিফাসও বলা হয় না। তথাপিও এম.আর করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা এম.আর এর কারণে যে রক্ত বের হয় একে মাসিক ধরা হয়। অতএব স্রাব শুরু হবার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কোন মহিলার ইফতারের আগ মুহূর্তে এম.আর শুরু করা হয়। আর ইফতারের সময় হবার পর স্রাব শুরু হয় তাহলে তার ঐ দিনের রোযা হয়ে যাবে।

তবে কখনো ৪২ দিন মতান্তরে ৫২ দিনেও কোনো অঙ্গ প্রকাশ হয়ে যায়। যদি কারোর ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় তাহলে তা গর্ভপাত হিসেবে ধর্তব্য হবে। তখন এক্ষেত্রে গর্ভপাতের কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী স্রাবও নিফাস হিসাবে গণ্য হবে।

খ. ডি এন্ড সি

ডি এন্ড সি করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ডি এন্ড সি হলো, রাস্তা প্রশস্ত করা ও চেছে নিয়ে আসা।

আট সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডি এন্ড সি বলে।

এ সময়ের মধ্যে যেহেতু বাচ্ছা অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাই তা গর্ভপাতের হুকুমে হবে এবং এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এর পরবর্তীতে স্রাব নিফাস হিসাবে গণ্য হবে।

৮। কপার-টি

কপার-টি করলে রোযা ভাঙ্গবে না। কপার-টি বলা হয়, যোনিদ্বারে প্লাস্টিক ফিট করা যাতে সহবাসের সময় বীর্য জরায়ুতে পৌঁছাতে না পারে। এমন করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে কপার-টি সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

৯। সাপোজিটরি-ভলটালিন

সাপোজিটরি-ভলটালিন ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অতিরিক্ত জ্বর কিংবা খুব বেশি ব্যথা দেখা দিলে ঔষধটি মলদ্বারে ব্যবহার করা হয়। এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ, যে

সমস্ত রাস্তা দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায় মলদ্বার তার একটি।

১০। ডুশ

ডুশ নিলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ ডুশ মলদ্বারের মাধ্যমে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। মলদ্বারে রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা এবং ডুশ যে জায়গায় প্রবেশ করে ঐ জায়গাও রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালিস্থান।

১১। প্রক্টোসকপি

প্রক্টোসকপি করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। পাইলস, ফিশার, ফিষ্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি রোগের পরীক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষাটি করা হয়। যদিও নলটি পুরোপুরি ভিতরে ঢুকে না, একাংশ বাইরে থাকে কিন্তু যাতে রোগী ব্যথা না পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্লিসারিন জাতীয় পিচ্ছিল কোন বস্তু ব্যবহার করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে যদিও ঐ পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সাথে থাকে এবং নলের সাথেই বেরিয়ে আসে, ভেতরে থাকে না আর থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে চলে আসে। শরীর তা চোষে না। তথাপিও ঐ বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর এর মধ্যেই সতর্কতা।

১২। ল্যাপারসকপি-বায়োপসি

পেট ছিদ্র করে সিক জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের ভেতরের কোন অংশ, গোশত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য বের করে আনা হয়। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ রোযা ভঙ্গ হওয়ার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু ভেতরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করা ও প্রবেশের সাথে সাথে বের না হয়ে ভিতরে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভিতর থাকলে ঐ বস্তু বা তার অংশবিশেষ হজম হয়ে যায়। এখানে কোনোটি পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে কোন প্রকার ঔষধ লাগানো থাকলে এবং তা গলদ্বার থেকে নিয়ে মলদ্বার পর্যন্ত নাড়িভুঁড়ির যে কোনো জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৩। সিরোদকার অপারেশন

সিরোদকার অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। সিরোদকার অপারেশন হলো অকাল গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের চতুর্দিকে সেলাই করে মুখকে খিঁচিয়ে রাখা হয়। এতে করে অকাল গর্ভপাত রোধ হয়। এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। কেননা এমন করলে কোন বস্তু রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য কোনো খালিস্থানে পৌঁছে না।

উল্লেখ্য যে, সেলাইয়ের সময় সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এতেও রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ নয়।

(ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, পৃঃ ৩২৭-৩৩১)

১৪: মস্তিস্ক অপারেশন

রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক অপারেশন করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও মস্তিস্কে কোন তরল কিংবা শক্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিস্ক থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন ছিদ্র ও পথ নেই। তাই মস্তিস্কে কোন কিছু দিলে তা গলায় পৌছে না। পূর্ব যুগে ছিদ্র ও পথ আছে ধারণা করেই এতে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে ।

১৫: কানে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার

কানে ড্রপ, ঔষধ তেল ও পানি ইত্যাদি দিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ কান থেকে গলা পর্যন্ত কোন রাস্তা নেই। আদি যুগে ছিদ্র পথ আছে বলে ধারণা করা হতো বিধায় সে যুগের কিতাবাদিতে রোযা ভেঙে যাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে ।

১৬: ছোখে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার

ছোখে ড্রপ, সুরমা ও মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও এগুলোর সাধ গলায় উপলব্ধি হয়। কারণ চোখে কিছু দিলে রোযা না ভাঙ্গার কথা হাদীস দারা প্রমাণিত।

১৭: নাকে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার

নাকে ড্রপ, পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে

রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ নাক রোযা ভঙ্গ হবার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে ড্রপ ইত্যাদি দিলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১৮: মুখে ঔষধ ব্যবহার

মুখে ঔষধ ব্যবহার করলে তা গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে । যতই অল্প হোক।

১৯: রক্ত দেয়া ও নেয়া

রক্ত দিলে অথবা নিলে কোন অবস্থাতেই রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত দিলে কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢোকেনি, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। আর রক্ত নিলে যদিও তা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিন্তু তা রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না। তেমনি ভাবে গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না বিধায় এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

২০: সালবোটামল (SALBUTAMOL),ইনহেলার (INHALER) ব্যবহার

সালবোটামল , ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । শ্বাস কষ্ট দূর করার জন্য ঔষধটি মুখের ভিতর স্প্রে করা হয়। এতে যে জায়গায় শ্বাস রুদ্ধ হয় ঐ জায়গাটি প্রস্তুত হয়ে যায় । ফলে শ্বাস চলাচলে কোন কষ্ট থাকে না। ঔষধটি যে শিশিতে যে পরিমাণে থাকে ঐ শিশির মুখ একবার টিপলে শিশির আকার ভেদে ঐ পরিমানের একশত কিংবা দুইশত ভাগের এক ভাগ বেরিয়ে আসে।অতি স্বল্প পরিমাণে গ্যাসের ন্যায় বের হওয়ার কারণে কেউ ঔষধটিকে বাতাস জাতীয় মনে করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয় বরং ঔষধটি দেহবিশিষ্ট। কাঠ ইত্যাদি কোন বস্তুতে স্প্রে করলে দেখা যায় যে,ঐ বস্তুটি ভিজে গেছে। তাই এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনেকে বলতে শোনা যায় যে , ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। এ কথাটি একেবারেই হাস্যকর। কেননা কেহ যদি ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অতি প্রজনীয় কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে কি অতি প্রয়োজনে খাওয়ার কারণে তার রোযা ভঙ্গ হবে না? অবশ্যই হবে। অতি প্রয়োজনের সময় রোযা ভাঙলে পরবর্তীতে কাযা করা ও এতে গুনাহ না হওয়া ভিন্ন কথা। আর রোযা ভঙ্গ না হওয়া ভিন্ন কথা। হ্যাঁ, যদি মুখে ইনহেলার স্প্রে করার পর না গিলে থুতু দিয়ে তা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। এভাবে কাজ চললে তো বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাস কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোযা ও ভঙ্গ হলো না।

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের নিয়ম

কোন কোন চিকিৎসক বলেন: সাহারীতে এক ডোজ ইনহেলার নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত আর ইনহেলার নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যাঁ, যদি কারো বক্তব্যাধি এমন জটিল ও মারাত্মক আকার ধারণ করে যে ,ইনহেলার নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়াতে এই সুযোগ রয়েছে যে, তারা প্রয়োজন ভেদে ইনহেলার ব্যবহার করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাজা করে নিবে। আর কাজা সম্ভব না হলে , ফিদিয়া আদায় করবে।

উপসংহার

রমযান হলো খালেছ ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার ও উক্ত ফজিলত লাভ করার তাওফীক দান করুন।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111312065/